শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রয়োজনেই
শিবদাস ঘোষ
মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছিলেন

৫ আগস্ট ২০২৩ ব্রিগেড সমাবেশে

প্রভাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

শোষণমুক্তির সংগ্রামের প্রয়োজনেই
শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছিলেন

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০২৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ২০২৩

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩

মূল্য ঃ ১০ টাকা

প্রকাশকের কথা

এ যুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের সমাপনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ আগস্ট কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সমাবেশে দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের বক্তব্য সংক্ষেপিত আকারে দলের বাংলা মুখপত্র গণদাবীর ৭৬ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পাঠকদের চাহিদা থাকায় গত সেপ্টেম্বর মাসে পুস্তিকাকারে এটি প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে তাঁর পূর্ণাঙ্গ ভাষণ প্রকাশ করা হচ্ছে। প্রকাশের পূর্বে কমরেড প্রভাস ঘোষ কিছু পরিমার্জনা ও পরিবর্ধন নিজেই করে দিয়েছেন।

আশা করি, পুস্তিকাটি আগামী দিনে সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সংগ্রামী বামপন্থী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণকে সাহায্য করবে।

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

অক্টোবর ২০২৩

আজকের এই সমাবেশে কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক মহিলা, বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যবিত্তরা এবং ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রতিনিধি যাঁরা এসেছেন, আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাঁদের স্বাগত জানাই। বিভিন্ন রাজ্যে আমাদের কর্মীরা যখন অর্থ সংগ্রহ করছিলেন, যে সমস্ত জনগণ অত্যন্ত সানন্দে, উদারভাবে তাদের সাহায্য করেছেন, আমাদের বন্ধুবান্ধব যাঁরা সাহায্য করেছেন— তাঁদেরও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সাহায্যে এই ফান্ড সংগ্রহ করতে না পারলে আজকের ঐতিহাসিক কর্মসূচি আমরা সম্পন্ন করতে পারতাম না। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। আপনারা জানেন, আমরা সব সময়েই সাধারণ মানুষের চাঁদার উপরেই নির্ভর করি। এই সমাবেশে জমায়েত মানুষের অধিকাংশ বাংলাভাষী। তাই আমার বক্তব্য বাংলায় রাখব। অন্য রাজ্যের ভিন্নভাষীরা এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু কেনা যাবে না

প্রথমেই আমি সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বক্তব্যের কয়েকটি লাইন আপনাদের পড়ে শোনাব। "প্রথম যখন এই দল শুরু হয়, কী ছিল আমাদের? কিছুই ছিল না। টাকা নেই, পয়সা নেই, লোকজন নেই, থাকার জায়গা নেই, কেউ চেনে না, জানে না। ... আমি তখন অল্প বয়সের যুবক, সেই আমি বলছি, ভারতবর্ষে সত্যিকারের কোনও বিপ্লবী দল নেই, দল গঠন করতে হবে। অনেকেই যুক্তি শুনে বলেছে, এটা তো করা উচিত। যুক্তিগুলি তো ভালই, কিন্তু এ একটা পাগলের মতো কথা। এ অসম্ভব ব্যাপার। এ হতে পারে না। আমিও সঙ্গে সঙ্গে বেশি তর্ক করিনি। আমি তাদের পাল্টা উত্তর করেছি, হ্যাঁ, হবে না মেনে নিলাম। তা হলে কী করতে হবে বলুন। গোলামি করব? দালালি করতে হবে? বিবেক বিক্রি করতে হবে? আমি পারব না। এই লড়াই করতে গিয়ে যদি খেতে না পেয়ে রাস্তায় আমি মারাও যাই, আমি মাথা উঁচু করে মরব— আমাকে গুলি করে মারা যাবে, কিন্তু আমাকে কেনা যাবে না।

এমনকি মাথা গোঁজার মতো ঘরও জোগাড় করে উঠতে পারিনি, যখন না খেয়ে দিনের পর দিন একটা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে আমাদের একটি নতুন পার্টি গড়ে তোলার জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে, এ নিয়ে সে দিন কিন্তু আমাদের মনে কোনও ক্ষোভ ছিল না।

সিপিআই তখন অবিভক্ত একটা পার্টি। আমাদের দেখিয়ে বিদ্রূপ করেছে, বলেছে, ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, বলেছে, চামচিকাও পাখি আর এসইউসিআইও পার্টি—এদের সঙ্গেও বসতে হবে! এ সবই আমি চুপ করে সহ্য করেছি। তাদের

কোনও বিদ্রুপই গায়ে মাখিনি। শুধু দলটা গড়ে তোলার জন্য একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়েছি। আমরা কত বছর মাদুরে শুয়েছি, কত শীত-গ্রীষ্ম আমাদের এ ভাবে কেটেছে। ... আমরা কত দিন খাইনি, তা নিয়ে আমরা কারও কাছে কিছু বলতেও লজ্জাবোধ করতাম। কারণ মনে হত, খাবার জোগাড় করতে পারিনি, সমর্থক নেই, পাঁচটা পয়সা চাঁদা তুলতে পারিনি, লোকে দেয়নি, এটা আমাদেরই অক্ষমতা। এটার মধ্যে আবার গর্ব করে বলার কী আছে। ত্যাগের কী মাহাত্ম্য আছে! ... বিপ্লবীদের অভাব, অনটন, হাজার দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন যা দেখে সাধারণ মানুষ তাদের জন্য দুঃখ করে, সেই আপাতদৃষ্ট দুঃখময় বিপ্লবী জীবনের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে একজন বিপ্লবী যে শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পায়, সাধারণ মানুষ বাড়ি, গাড়ি, আরামের মধ্যে তার হদিশ খুঁজে পায় না। বিপ্লবের থেকে বড় সম্পদ, বিপ্লবী জীবনের থেকে বড় জীবন তার আর কিছুই নেই। ... আমি জানি, আমাকে হয়তো না খেয়ে মরতে হবে। একটা লোক না খেয়ে মরছে কি না তার খবরটাও কেউ নিতে আসবে না। ... কিন্তু কোনও কিছুই বিফলে যায় না, সকল বিপ্লবীই জানে ঐ যে সে না খেয়ে নিঃশেষে মরে গেল, দশটা লোকের মধ্যে, পঞ্চাশ-একশোটা লোকের মধ্যে শুধু বলে গেল যে যথার্থ বিপ্লবী আদর্শ ও দল ছাড়া কিছু হবে না, এটা ব্যর্থ হয় না, ব্যর্থ হতে পারে না।”

তিনি বলেছিলেন, এই সংগ্রাম ব্যর্থ হতে পারে না। তাঁর এই সংগ্রাম যে ব্যর্থ হয়নি এই বিশাল সমাবেশই তা দেখিয়ে দিচ্ছে। সারা দেশে আমাদের সংগঠনের একটা ছোট অংশ নিয়ে আজকের এই জমায়েত। দেশের ২৬টি রাজ্য থেকে কর্মী এবং সমর্থকরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের সমস্ত শক্তিকে একত্রে সমবেত করার মতো উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করার আর্থিক ক্ষমতা আমাদের নেই।

কমরেড শিবদাস ঘোষ আজও বেঁচে আছেন আমাদের বুকের মধ্যে। তাঁর দেখানো পথেই এই পার্টি চলছে, এই পার্টি এগিয়ে চলেছে। এই সেই শহর যেখানে এই মানুষটি একটি বিপ্লবী দল গড়ার স্বপ্ন নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অভুক্ত, অর্ধভুক্ত থেকে, খোলা আকাশের নিচে কখনও পার্কে, কখনও রেল স্টেশনে, কখনও কোলে মার্কেটের ছাদে রাত কাটিয়েছেন। একটা আশ্রয় জোটেনি, খাদ্য জোটেনি, কিন্তু তিনি একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। আজ গোটা ভারতবর্ষে এই পার্টি বিস্তার লাভ করছে কোনও এমএলএ, এমপি-র জোরে নয়, কোনও সরকারের জোরে নয়, কোনও মিডিয়ার পাবলিসিটির জোরেও নয়, একমাত্র মহান মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ, আর তাকে আরও বিকশিত, উন্নত করেছেন যিনি, সেই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার শক্তির জোরে।

সেই সময় এই মহান মানুষটিকে যারা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছিল, তেমন তিনটি দল আরসিপিআই, ডেমোক্রেটিক ভ্যানগার্ড, বলশেভিক পার্টির আজ কোনও অস্তিত্ব নেই। আরএসপি, ফরওয়ার্ড ব্লক যে ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে, তাদের নেতারা আমাদের

থেকে ভাল জানেন। আর অবিভক্ত সিপিআই এক সময় পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল ছিল। ১৯৬৪ সালে দল বিভক্তির পরে সিপিএম শক্তিশালী ছিল। একসময় কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরায় তারা সরকার চালাত। তখন তাদের কী দাপট! পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর একটানা সরকার চালিয়ে তারা এত শক্তি সঞ্চয় করেছে যে এখন ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শক্তি সংগ্রহের জন্য কংগ্রেস ও একজন পীরকে সেকুলার বানিয়ে তাদের হাত ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আর, সিপিআইও ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা কিন্তু এগোচ্ছি সঠিক বিপ্লবী আদর্শের শক্তিতে।

একটা নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে ছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। তিনি যখন স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লববাদের আহ্বানে কৈশোরেই ঘর ছাড়ছিলেন, গরিব নিম্নবিত্ত পরিবারের বাবা-মা বলছেন, আমাদের কে দেখবে? তাঁদের একটি কথাই তিনি বলেছিলেন— লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাবা-মা পথে ঘাটে কাঁদছে। আমি সকলের সন্তান। সকলের চোখের জল মোছানো আমার কাজ। পরবর্তীকালে তাঁর একটা ঐতিহাসিক উক্তি—'বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি'—যেটা সমস্ত যুগের সমস্ত বড় মানুষের অব্যক্ত কথা, তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। সব যুগে, বুদ্ধ থেকে যিশু, মহম্মদ, নবজাগরণের মনীষীরা, স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধারা এবং সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের যোদ্ধারা সকলের মনের অব্যক্ত কথা হচ্ছে এটাই। এটা আমাদেরও তিনি শিখিয়ে গেছেন।

গণমুক্তির জন্য সঠিক পথ কোনটা

সেই সময়ে তিনি শুধু ব্রিটিশ শাসনের অবসানই চাননি, তিনি চেয়েছিলেন শোষিত শ্রমজীবী মানুষের শোষণমুক্তিও। কিন্তু কী ভাবে সেটা সম্ভব, সেই পথ খুঁজছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। জনগণের মুক্তির জন্য সঠিক পথ কোনটা? ধর্মীয় পথে সে মুক্তি সম্ভব কি? তিনি বিচার করে বুঝলেন, সে পথে সম্ভব নয়। কারণ ধর্মীয় চিন্তার শেষ কথা হচ্ছে— এই দুনিয়াকে চালায় সর্বশক্তিমান ভগবান, আল্লা, গড। ধনী-গরিব তারই সৃষ্টি। ভালমন্দ যা কিছু ঘটছে সবই বিশ্বপিতার ইচ্ছা, তার ইচ্ছাতেই কর্ম। ধনীরা পূর্বজন্মের পূণ্যফলে ধনী আর গরিবরা পূর্বজন্মের পাপজনিত কর্মফল ভোগ করছে। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, কোরান, বাইবেল, বেদ-বেদান্ত, কোথাও এই প্রশ্নের উত্তর নেই যে বেকারদের চাকরি কী ভাবে হবে, ছাঁটাই কী করে আটকানো যাবে, মূল্যবৃদ্ধি কী করে রুখবে;শিক্ষার সুযোগ, চিকিৎসার সুযোগ, বাঁচার সুযোগ, নারীর মর্যাদা কী ভাবে রক্ষা পাবে।

অতীতের বড় মানুষদের চিন্তা-আদর্শ থেকেও কি পথের সন্ধান মিলবে? সেখানেও দেখছেন মতপার্থক্য। একজন বড় মানুষ বিদ্যাসাগর। তিনি বলেছেন, বেদ-বেদান্তে, ধর্মীয় শাস্ত্রে সত্য নেই। এগুলি সব ভ্রান্ত। আমাদের জানতে হবে ইউরোপের বিজ্ঞান, ইউরোপের বস্তুবাদ। বিদ্যাসাগর ঈশ্বর মানতেন না।

আরেকজন বড় মানুষ বিবেকানন্দ, তিনি বেদান্তের জয়গান করে গেলেন। সেই বিবেকানন্দও বলতেন, বিদ্যাসাগর খুবই বড় মানুষ। তা হলে কার কথা মানবেন? বিদ্যাসাগর না বিবেকানন্দ?

কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝলেন, সঠিক উত্তর একমাত্র দিতে পারে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা। বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারই পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত। জল কী— বিশ্বের সর্বত্র বিজ্ঞানের উত্তর একটাই। ইলেকট্রিসিটি কী— উত্তর একটাই। এগুলি পরীক্ষিত, প্রমাণিত। এই বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে যে ঐতিহাসিক দর্শন মার্ক্সবাদ এসেছে, তা হচ্ছে বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন। এই মার্ক্সবাদকে ভিত্তি করেই একমাত্র সঠিক সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান দেখিয়েছে বস্তুগজগৎ নিরন্তর পরিবর্তনশীল, গতিশীল। এই পরিবর্তনের, এই গতির নিয়ম আছে। প্রত্যেকটি বিশেষ বস্তুর বিশেষ নিয়ম আছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন নিয়ম আছে। এই নিয়মকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জানা যায়। তার ভিত্তিতে ক্রিয়া করা যায়। বস্তুর মতো এই নিয়মকেও সৃষ্টি করা যায় না, ধ্বংস করা যায় না। বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন নিয়মকে কো-অর্ডিনেট করে, কো-রিলেট করে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে আবিষ্কার হয়েছে মার্ক্সবাদী দর্শন।

ফলে মার্ক্সবাদ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন, যার ভিত্তিতে নিয়ম নিয়ন্ত্রিত, নিরন্তর পরিবর্তনশীল বিশ্বের সব কিছুকে স্টাডি করা যায়। একমাত্র তার ভিত্তিতেই যে সত্য পাওয়া যাবে সেই সত্যের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষকে পথ দেখানো সম্ভব। এই মার্কসবাদ দেখিয়েছে, কোনও সমাজব্যবস্থা, তার অর্থনীতি, রাজনীতি, নীতিনৈতিকতা, বিধিবিধান, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি কোনওটাই চিরস্থায়ী নয়। বস্তুজগতের মতোই এগুলিও নিয়ম নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তনশীল। মানুষের সচেতন ভূমিকাই এই পরিবর্তন ঘটায়। এই মার্ক্সবাদকে হাতিয়ার করেই তিনি এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিচার করলেন।

তিনি দেখলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে এত শহিদের এত আত্মদান, অথচ নেতৃত্বে পুঁজিপতি টাটা-বিড়লাদের মদতে গান্ধীবাদী কংগ্রেস। আর একটা ধারার নেতৃত্বে আছে মধ্যবিত্ত সশস্ত্র বিপ্লবী সংগঠনগুলি— অনুশীলন, যুগান্তর, হিন্দুস্তান রিপাবলিকান পার্টি, গদর পার্টি। এ রকম অনেক বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী গোষ্ঠী।

সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করা হয়েছিল

সেই সময়ে ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, "... ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা আপসকামী ও বিপ্লবী শক্তিতে বিভক্ত হয়েছে এবং বুর্জোয়াদের আপসকামী অংশ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদের সাথে সমঝোতা করেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদের থেকেও বিপ্লবকে বেশি ভয় করে এবং দেশের স্বার্থের

থেকেও মুনাফার স্বার্থকে বেশি গণ্য করে। ... এই আপসকামী জাতীয় বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করে গ্রাম ও শহরের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বুর্জোয়াদের বিপ্লবী অংশের সাথে প্রকাশ্যে ব্লক গঠন করতে হবে।" কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখলেন, কমিউনিস্ট বলে পরিচিত সিপিআইয়ের ভূমিকা ছিল স্ট্যালিনের এই আবেদনের সম্পূর্ণ বিরোধী, মার্ক্সবাদবিরোধী। এক সময়ে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লবীরা একত্রিত হয়ে আপসমুখী গান্ধীবাদী নেতৃত্বের বিকল্প হিসাবে সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করেছিল। এই সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে বলেছিলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন আমাদের বন্ধু, যার ভয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা কাঁপে। বলেছিলেন, স্বদেশি আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষককে আনতে হবে, জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই। বলেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। এর ফলে বুর্জোয়ারা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, গান্ধীবাদীরা ভয় পেয়ে গেল। তারা পরের বার ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে সুভাষচন্দ্রকে পরাস্ত করার জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড় করাল পট্টভি সীতারামাইয়াকে। তা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র জিতলেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে। কিন্তু জেতার পরে বুর্জোয়ারা গান্ধীজির নেতৃত্বে একটা ষড়যন্ত্র করল। ত্রিপুরী অধিবেশনে প্রস্তাব আনল যে কংগ্রেসে গান্ধীজির মত নিয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত করতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটিও গঠন করতে হবে গান্ধীজির অনুমোদন নিয়ে। এই প্রস্তাবে সিপিআই, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গান্ধীবাদীদের সমর্থন করল। সুভাষচন্দ্র পরাস্ত হলেন। এর পরে কংগ্রেস নেতৃত্ব নানা অজুহাত তুলে সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই কাজ করতে দিচ্ছিল না। ফলে কলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ১৯৩৯ সালের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এরপর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ডাক দেওয়ায় সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সাসপেন্ড করল। অর্থাৎ নেতাজির ভাষায় 'কংগ্রেস থেকে বিতাড়ন করে দিল'। আজকের দিনে অনেকেই এইসব ইতিহাস জানেন না।

তারপর সুভাষচন্দ্র রামগড়ে ১৯৪০ সালে পাল্টা অধিবেশনে 'লেফট কনসোলিডেশন' ফ্রন্ট গড়ার ডাক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে বলেছিলেন, "... একমাত্র এইভাবেই দক্ষিণপন্থীদের ঠেকানো যেত এবং একটা মার্ক্সবাদী দল গড়ে ওঠার জমি প্রস্তুত করা যেত।" কিন্তু ওরা যায়নি। সুভাষচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন, "কমিউনিজমের বিশ্বজনীন এবং মানবিক আবেদন সত্ত্বেও ভারতে কমিউনিজম বেশি অগ্রগতি করতে পারেনি। প্রধানত এই কারণে যে এ দেশে তার নেতারা যেসব পদ্ধতি এবং কলাকৌশল অবলম্বন করেছেন, তাতে মানুষকে আকর্ষণ করে বন্ধু ও সহযোগী বানানোর চেয়ে বরং শত্রুভাবাপন্ন করে তোলে।" তারা সুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বের বিকল্প নেতৃত্ব গড়ার সুযোগকে কাজে লাগালো না এবং বাস্তবে বুর্জোয়া নেতৃত্বকেই কায়েম

হতে সাহায্য করল। শ্রমিক-কৃষককেও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করার জন্য সংগঠিত করল না। '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে গোটা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলে উঠেছিল, ইংরেজরা ভয়ে কাঁপছিল, গান্ধীবাদীরা ভয়ে কাঁপছিল। সেই আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করল সিপিআই। এ দেশে একদল ভেবেছিল যেহেতু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইংল্যান্ডের সাথে মৈত্রী করেছিল, সেই জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্দেশে সিপিআই এই কাজ করেছিল।

কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল। সিপিআই নেতারা যখন ১৯৫২ সালে মস্কোয় গিয়েছিলেন, স্ট্যালিন তাদের ১৯৪২ সালের ভূমিকার জন্য তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সিপিআই-এর ভূমিকা হচ্ছে এই। সুভাষচন্দ্র কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার ট্যাকটিক্স হিসাবে জাপানের সাহায্য নিয়ে আইএনএ বাহিনী গঠন করেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের মতো দেশপ্রেমিক কি জাপানের দালাল ছিলেন? ভারতবর্ষে জাপানের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন? তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে জাপানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি আইএনএ বাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহারও করতে দেননি। অথচ সিপিআই সুভাষচন্দ্রকে বলল, জাপানের দালাল। যখন দেশ ভাগের প্রশ্ন উঠল, হিন্দু মহাসভা দেশ ভাগ চাইল, মুসলিম লিগ চাইল, সিপিআইও দেশ ভাগকে সমর্থন করল। বলল— হিন্দু আলাদা জাতি, মুসলিম আলাদা জাতি।

পুঁথি পড়া বিদ্যা দিয়ে মার্ক্সবাদ আয়ত্ত করা যায় না

এইসব একের পর এক ঘটনা শিবদাস ঘোষ মার্ক্সবাদ অনুযায়ী স্টাডি করেছিলেন। স্টাডি করে কেন এরকম হল—এটা বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝলেন, সিপিআইয়ের নেতারা সৎ নিষ্ঠাবান, মার্ক্সবাদে এদের পাণ্ডিত্য আছে—এ কথা ঠিক। কিন্তু পাণ্ডিত্য আর জ্ঞান এক নয়। পাণ্ডিত্য হচ্ছে অনেক বই পড়া, পুঁথিপড়া বিদ্যা। মার্ক্সবাদ পুঁথিপড়া বিদ্যা দিয়ে আয়ত্ত করা যায় না। মার্ক্সবাদকে জীবনে প্রয়োগ করতে হয়। মার্ক্সবাদ হচ্ছে জীবনদর্শন। মার্ক্স বলেছেন, 'টু চেঞ্জ দি ওয়ার্ল্ড, ওয়ার্কার্স হ্যাভ টু চেঞ্জ দেমসেল্‌ভস ফার্স্ট'। দুনিয়াকে পাল্টাতে হলে আগে নিজেকে পাল্টাও। আমরা সকলেই পুঁজিবাদী সমাজে জন্ম নিয়েছি। প্রত্যেকের টাকার প্রতি লোভ আছে, সম্পত্তির প্রতি লোভ আছে, নাম করার ঝোঁক আছে, পদের মোহ আছে, পারিবারিক দুর্বলতা আছে, স্বার্থপরতা আছে, সামন্ততান্ত্রিক চিন্তারও প্রভাব আছে। এই চরিত্র নিয়ে মার্ক্সবাদী হওয়া যায় না। ফলে এই সব বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও সামন্ততান্ত্রিক আচারব্যবহার থেকে মুক্ত হতে হবে।

মার্ক্সবাদকে ভারতের পরিস্থিতিতে বিশেষীকৃত করেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ

দল গঠনের প্রশ্নে মহান লেনিন 'হোয়াট ইজ টু বি ডান' পুস্তকে বলেছিলেন, "একটা ডিক্রি জারি করে, কিছু লোক একত্রে বসে প্রস্তাব পাশ করে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা যায় না। তার জন্য একটা আদর্শগত সংগ্রাম দরকার ইউনিটি অফ আইডিয়া অর্জনের জন্য।' অর্থাৎ মার্ক্সবাদী আদর্শ নিয়ে যারা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তুলবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথমে গড়তে হবে চিন্তার ঐক্য। এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই সঠিক বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে—তা আয়ত্ত করার জন্য একটা সংগ্রাম দরকার। অর্থাৎ মার্ক্সবাদ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি কী, জীবনে তার প্রয়োগ কী হবে, কী পদ্ধতিতে দল গঠন হবে, বিপ্লবের লাইন কী হবে—এইসব প্রশ্নে প্রথমে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার জন্য আদর্শগত সংগ্রাম দরকার, যে আবশ্যিক সংগ্রামটি সিপিআইয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে নেতারা করেননি। কলকাতা, বম্বে, কানপুর, দিল্লির কয়েক জন ব্যক্তি যাঁরা কমিউনিজম নিয়ে ভাবছেন, তাঁরা হঠাৎ ঠিক করলেন আমরা একটা পার্টি গড়ব কয়েকটা গ্রুপ মিলে। ফলে পার্টি গঠন পর্বেই তারা লেনিনের গাইডলাইনকে লঙঘন করলেন। লেনিন এটাও বলেছিলেন, মার্ক্সবাদের জেনারেল লাইন বা সাধারণ নীতি বিশেষ দেশে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষ ভাবে প্রয়োগ হবে। বলেছিলেন রাশিয়াতে যে ভাবে হবে জার্মানিতে সে ভাবে হবে না, জার্মানিতে যে ভাবে হবে ইংল্যান্ডে সে ভাবে হবে না, ইংল্যান্ডে যে ভাবে হবে ফ্রান্সে সে ভাবে হবে না।

আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলার শর্ত

ফলে এই শিক্ষা অনুযায়ী ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও বিপ্লবের জেনারেল লাইনকে বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ভারতবর্ষের বিশেষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ সংস্কৃতি, এ দেশের বুর্জোয়া চিন্তা, বুর্জোয়া ভাববাদ, এ দেশের হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, এ দেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি, এই সবকিছুর প্রশ্নেই মার্ক্সবাদের বিশেষ প্রয়োগ কী হবে, যাকে বলা হয় কংক্রিটাইজেশন অফ মার্ক্সইজম ইন এ কংক্রিট সিচুয়েশন অফ এ পার্টিকুলার কান্ট্রি, এইসব নিয়ে সিপিআই নেতারা একদম ভাবেনইনি। লেনিনের এই শিক্ষাকে তারা কোনও গুরুত্বই দেননি। লেনিন এই কাজটা রাশিয়ায় করেছিলেন, মাও সে তুঙ-ও চিনে করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এটা বুঝেছিলেন। সেই জন্য তিনি তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই (সি) দল গঠনপর্বে লেনিনের এই শিক্ষাকে

প্রয়োগ করতে গিয়ে লেনিন পরবর্তী যুগে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের শিক্ষাকে আরও বিকশিত ও উন্নত করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় তিনি দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য সহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু অবদান রেখেছেন।

দ্বিতীয়ত, কমরেড শিবদাস ঘোষ বুঝেছিলেন, যাঁরা দল গঠন করছেন, তাঁদের মধ্যে মার্ক্সবাদী পদ্ধতিতে আদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সকল প্রশ্নে একটা যৌথ সর্বসম্মত চিন্তা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ অনুযায়ী গড়ে তুলতে হবে। এই সর্বসম্মত চিন্তা ব্যক্ত হবে যিনি যৌথ চিন্তার অভিব্যক্তিতে সবচেয়ে অগ্রণী, তাঁর মধ্য দিয়ে। তিনিই হচ্ছেন চিন্তানায়ক। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুং হচ্ছেন তাই। আমাদের দেশে সিপিআই যেহেতু এই ধরনের আদর্শগত সংগ্রাম করেনি, সেই জন্য এই ধরনের কোনও চিন্তানায়ক তারা গড়ে তুলতে পারেনি। আমাদের দলে এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই কমরেড শিবদাস ঘোষের মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক হিসাবে অভ্যুত্থান ঘটেছে। এটা কোনও প্রস্তাব পাশ করে হয়নি। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েই এই চিন্তানায়কের অভ্যুত্থান ঘটেছে। এই প্রক্রিয়াতেই আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে ওঠে। তৃতীয় প্রয়োজন এমন একদল বিপ্লবীর, যারা সত্যিকারের উন্নত মানের কমিউনিস্ট, যারা শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছে তাই নয়, তাদের চিন্তার ক্ষেত্রেও সম্পত্তিভিত্তিক মানসিকতা— অর্থাৎ আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার স্বার্থ, আমার মনে হওয়া, আমার ভাল লাগা, আমি যা মনে করি সেটাই ঠিক, আমার নাম, আমার পদ, আমার রাগ, আমার অভিমান, আমার প্রেম প্রীতি ভালবাসা, অপত্য স্নেহ— এই সমস্ত থেকে মুক্ত। সম্পত্তি না থাকলেও সম্পত্তিভিত্তিক মানসিকতা থাকে। এর থেকেও যারা মুক্ত, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণি ও বিপ্লবের স্বার্থই আমার স্বার্থ, বিপ্লবী দলের স্বার্থই আমার স্বার্থ, এইভাবে যারা একাত্ম হয়ে গেছে— এমন স্তরের লোকেরাই হবে দলের নেতা। যতক্ষণ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন ধরনের নেতা তৈরি না হচ্ছে, ততক্ষণ বিপ্লবী দল গড়া যায় না। এই তিনটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এস ইউ সি আই (সি) গঠন করেছিলেন।

আর একটা বিষয়ও কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন— 'যে কোনও আদর্শ, যে কোনও দর্শন, যে কোনও বড় মতবাদের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার নৈতিক মান এবং সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে। যেমন প্রাণহীন দেহকে আবর্জনা স্বরূপ ফেলে দিতে হয়, মমতাভরে আটকে রাখলে তা পূতিগন্ধময় অবস্থায় সমাজে মানুষের অকল্যাণ সাধন করে, তেমনই উন্নত নৈতিকতা ও সংস্কৃতি বর্জিত রাজনৈতিক মতবাদও পরিত্যাজ্য।' যদি কোনও রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন নৈতিক বলকে জাগাতে না পারে, সাংস্কৃতিক মানকে উঁচু করতে না

পারে, তবে মনে রাখবেন সে রাজনীতি অনিষ্টকর এবং তা অকেজো। এটাও কমরেড ঘোষের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আমাদের দলের বাইরের সাধারণ মানুষ অনেকেই এখানে আছেন। আপনারা আমাদের কর্মীদের প্রশংসা করেন। বলেন, আপনাদের দলটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই আলাদাটা কীসে? একটা হচ্ছে, আমরা ভোটসর্বস্ব পার্টি নই। আমরা বিপ্লবী দল। ভোটের জন্য আমরা নীতি-আদর্শ বর্জিত সুবিধাবাদের পথে যাই না। আমরা কোনও বড় দলের খোশামোদি করি না। আমাদের দলে উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতির, বিপ্লবী আদর্শের জীবন্ত চর্চা হয়। আর একটা দিক হচ্ছে, আমাদের কর্মীরা তো এই সমাজেরই ছেলেমেয়ে। কিন্তু এই সমাজের আর দশটা ছেলেমেয়ের থেকে আলাদা কেন? আলাদা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায়। কমরেড শিবদাস ঘোষ শিখিয়েছেন, আমাদের উন্নত চরিত্র চাই, সংস্কৃতি চাই। তিনি এক সময় দুঃখ করে বলেছিলেন, 'আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ সুরটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলি বিশ্বের থেকে আহরণ করেছি। কিন্তু দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। আজকের দিনে রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতার, রুচি-সংস্কৃতির উচ্চ মানটা নেমে গেছে। যে উচ্চ মানটা এক সময় এ দেশে গড়ে উঠেছিল, তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে গিয়েছি। আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না।'

এস ইউ সি আই (সি) কোথায় ও কেন স্বতন্ত্র

আমাদের দলে চরিত্র অর্জনের জন্য জীবন্ত একটা সংগ্রাম থাকে। তাই যাঁরা বলেন, আপনারা অন্যদের থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র— তার বৈশিষ্ট্য এই দুটি জায়গায়। একটা, আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে বিপ্লবী রাজনীতির চর্চা করি, জ্ঞানের চর্চা করি, আমরা চাই কর্মীদের জ্ঞানের মান উন্নত হোক। আর অন্য দিকে তাঁর শিক্ষায় আমরা উন্নত চরিত্র অর্জনের সাধনা করি। কমরেড শিবদাস ঘোষ এই শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষের মন জয় করবে ভদ্রতা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, শালীনতা দিয়ে। গায়ের জোরে নয়, দাপট দিয়ে নয়, মিথ্যা দিয়ে নয়, কুৎসা দিয়ে নয়। আমরা সেটা রক্ষা করে যাচ্ছি। আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষানুযায়ী প্রথমে নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বড় চরিত্রগুলি থেকে, বিপ্লবীদের চরিত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে পরে তার থেকে ছেদ ঘটিয়ে পরের ধাপ আরও উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের জন্য সংগ্রাম করছি। এই কমিউনিস্ট চরিত্র কী ভাবে অর্জিত হতে পারে, সেই সম্পর্কে তিনি

বলেছিলেন, "পার্টির কোনও না কোনও সংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার সংগ্রামের মধ্যে সক্রিয়ভাবে নিজেকে যুক্ত রেখে ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী চিন্তাভাবনা ও স্বার্থের সাথে অর্থাৎ বিপ্লবের স্বার্থের সাথে একাত্ম করে গড়ে তোলার নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্নত সংস্কৃতিগত মান অর্জন করার পথেই কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকারী কর্মীতে পরিণত হতে পারে।" এ জন্যই অন্য দল থেকে আমরা স্বতন্ত্র।

সিপিআই-এর প্রতিষ্ঠাতারা এইসব গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্সবাদী তত্ত্ব নিয়ে একদম মাথা ঘামাননি। তাদের রাজনৈতিক জীবন এবং পারিবারিক জীবন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তাঁরা কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কী হবে, জীবনে মার্ক্সবাদের প্রয়োগ কী ভাবে হবে, এ সব নিয়ে চিন্তা করেননি। পরবর্তী কালে সিপিএমের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। তার ফলে কর্মীদের কমিউনিজমের প্রতি, বামপন্থার প্রতি আবেগ, লড়াইয়ে মার খাওয়া, অনেক পরিশ্রম সত্ত্বেও তাঁরা প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারেনি। সিপিআই এবং সিপিএম উভয় পার্টিই যথার্থ মার্ক্সবাদী পার্টির বদলে বাস্তবে একটি পেটিবুর্জোয়া সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। অন্য দিকে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের বর্তমান যুগে, যেখানে ব্যক্তিবাদ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে লেনিনের দল গঠনের তত্ত্বকে কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও ডেভেলপ করেছেন, আরও উন্নত করেছেন— তার ভিত্তিতে দল গঠন করেছেন।

শিবদাস ঘোষই ভারতে সর্বহারা বিপ্লবের সঠিক রণনীতি নির্ধারণ করেছেন

'৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তর হলে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, ভারতবর্ষে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় এসেছে, সে অর্থে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতা এসেছে। এখানেও সিপিআই-এর সাথে পার্থক্য ঘটল। সিপিআই '৪৭ সালে বুঝতেই পারেনি যে রাজনৈতিক ভাবে দেশ স্বাধীন হয়েছে। বলেছে— এ স্টেপ ফরওয়ার্ড, এক ধাপ এগিয়েছি আমরা। বলেছে নেহেরু প্রগতিশীল, প্যাটেল প্রতিক্রিয়াশীল, নেহেরুকে সাপোর্ট করতে হবে। সিপিআই-সিপিএমের কোনও কর্মী যদি এখানে থাকেন, তাদের পার্টি কংগ্রেসের দলিলে দেখবেন, ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তাদের নেতারা বুঝতেই পারেননি যে ভারতবর্ষ বুর্জোয়া অর্থে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে। অন্য দিকে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, ভারতবর্ষে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং এরা শুধু বুর্জোয়া নয়, একচেটিয়া বুর্জোয়া। লেনিন যাকে বলেছেন হায়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটালিজম— ভারতীয় পুঁজিবাদ সেই স্তরে পৌঁছেছে। এখন তো ভারতীয়

বুর্জোয়ারা মাল্টিন্যাশনালের জন্ম দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে শিল্পে ও খনিতে। ফলে কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, ভারতের বিপ্লবের স্তর হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক। যেখানে ভারতীয় পুঁজিবাদ এই স্তরে পৌঁছেছে সেখানে সিপিএম নেতারা জাতীয় বুর্জোয়াকে প্রগতিশীল গণ্য করে আজও জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আউড়ে যাচ্ছেন। সিপিএম-সিপিআই এর ভারতের রাষ্ট্রচরিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা—ইট ইজ এ বুর্জোয়া-ল্যান্ডলর্ড স্টেট হেডেড বাই বিগ বুর্জোয়াজি।

ফলে তাদের মতে বিপ্লবের স্তর হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী এবং বিপ্লব করবে শ্রমিক-কৃষক-জাতীয় বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে। এ এক অদ্ভুত তত্ত্ব। এই বিগ বুর্জোয়াজি কে, তার কোনও উত্তর নেই। হয় কম্প্রাডর বুর্জোয়াজি যারা ইন্ডাস্ট্রি করে না, না হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ন্যাশানাল বুর্জোয়াজি। বাস্তবে এই বিগ বুর্জোয়াজিরাই মনোপলিস্ট, যাকে লেনিন বলেছেন, হাইয়েস্ট স্টেজ অফ ক্যাপিটাল, মানে ন্যাশানাল ক্যাপিটালেরই সর্বোচ্চ স্তর। তারপর ল্যান্ডলর্ড কারা? তারা কি গ্রামীণ বুর্জোয়া, জোতদার নাকি সামন্তপ্রভু জমিদার? লেনিন বলেছেন, কৃষিতে পুঁজিবাদ মানে হচ্ছে জমি, গ্রামীণ শ্রমিক ও কৃষিজাত ফসল সবই জাতীয় বাজারের পণ্য। ভারতবর্ষে জমি কেনাবেচা হয়, শুধু ধান-গম নয়, লতাপাতা-শাকসব্জিও বাইরে বিক্রির জন্য যায় আর গ্রামীণ শ্রমিকরা কখনও গ্রামে, কখনও শহরে কাজের জন্য ছুটছে। ফলে সামন্ততন্ত্র কোথায়? সামন্ততন্ত্রের ভূত থাকতে পারে। একমাত্র আচার-ব্যবহারে, জাতপাতে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবকে আপসমুখী বুর্জোয়ারা টিকিয়ে রেখেছে।

সিপিএম বন্ধুদের বলি, তাদের নেতাদের বর্ণিত বিগ বুর্জোয়াজিরা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে শুধু অনুন্নত দেশগুলিতেই নয়, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংল্যান্ডে, অস্ট্রেলিয়াতে লগ্নি পুঁজি ইনভেস্ট করেছে শিল্পে, খনিতে, নানা ক্ষেত্রে। বর্তমানে তারা বিদেশে ১৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে। এইসব সত্ত্বেও সিপিএম নেতৃত্ব জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব আউড়ে যাচ্ছেন। যারই পরিণতিতে বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে কখনও তারা কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করেছে, আবার কখনও কংগ্রেসের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলে বিজেপির সঙ্গে ঐক্য করেছে। অবিভক্ত সিপিআই ও পরবর্তী কালের সিপিএম সম্পর্কে এই সব আলোচনা করছি কোনও বিদ্বেষ থেকে নয়। এই আলোচনার কারণ, কেন তাদের অ-মার্ক্সবাদী ভূমিকার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষকে আলাদা যথার্থ মার্ক্সবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই (সি) গড়ে তুলতে হল, এটা বোঝাবার জন্য।

ভোটের লড়াইয়েও শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি চাই

আমরা ভোটে দাঁড়াই। নির্বাচন যতদিন থাকবে, যতদিন মানুষ তাতে জড়িয়ে যাবে, সেই মানুষগুলোর কাছে আমাদের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দাঁড়াই। কিন্তু আমরা কখনও যেনতেনপ্রকারেণ ভোটে জেতার চেষ্টা করি না। হিন্দু ভোট, মুসলিম ভোট, ওই জাতের ভোট, সেই জাতের ভোট, এ সবের চর্চা আমরা করি না। আমাদের কাছে কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলিম নয়, কেউ উচ্চবর্ণ নয়, কেউ নিম্নবর্ণ নয়, কেউ বাঙালি নয়, কেউ বিহারি নয়, কেউ মারাঠি নয়। আমাদের বিচারে ভারতবর্ষে একদিকে শোষিত জনগণ, আর অন্য দিকে শোষক শ্রেণি— এই দুটি শ্রেণি। এই শোষিত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বার্থ নিয়েই আমাদের ভোটের লড়াই। ফলে আমাদের দল সম্পূর্ণ আলাদা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জনগণকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে জিততে পারি ভাল, না পারলেও আমরা এই নীতি বিসর্জন দেব না। গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম চালিয়ে উন্নত নৈতিকতার ভিত্তিতে জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিয়ে বিপ্লবের প্রস্তুতি গড়ে তুলব।

ফ্যাসিবাদ আনে পুঁজিপতিশ্রেণি, কোনও দল নয়

আজ ফ্যাসিবাদের কথা মুখে মুখে। ১৯৪৯ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের এক ঐতিহাসিক উক্তি— বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইটালির পরাজয় হয়েছে, কিন্তু ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়নি। তিনিই প্রথম বলেছেন, উন্নত অনুন্নত সব পুঁজিবাদী দেশেই আজ ফ্যাসিবাদ বিভিন্ন রূপে আছে। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্যাসিবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য। একটা হচ্ছে পুঁজির একেন্দ্রীকরণ। মনোপলি ক্যাপিটাল হচ্ছে পুঁজির কেন্দ্রীভূত রূপ। আর একটা হচ্ছে, আগে আইনসভা, প্রশাসন যন্ত্র, বিচার বিভাগের যে আপেক্ষিক স্বাধীনতা ছিল, তাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে সমস্ত ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে কেন্দ্রীভূত করা। আর বলছেন, চিন্তার জগতে অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় চিন্তা— যেখানে যুক্তি নেই, কার্যকারণ সম্পর্ক নেই, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই— এই সবকে উৎসাহ দেওয়া। আর বিজ্ঞানের নামে শুধু যন্ত্র, মেশিন, কারিগরি বিজ্ঞানকে সামনে আনো। অধ্যাত্মবাদের সাথে কারিগরি বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটাও। মানুষের চিন্তাকে মেরে দাও, যুক্তিকে মেরে দাও, বিচারবোধকে মেরে দাও। তা হলে অন্ধের মতো দলকে মানবে, নেতৃত্বকে মানবে, সরকারকে মানবে, রাষ্ট্রকে মানবে— এই জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এই ফ্যাসিবাদ যথার্থ মানুষ গড়ার প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে। তখন সিপিআই সহ অনেকে তাঁর এই কথাকে বিশ্বাসই করতে চায়নি। এখানে আমি আর একটা কথা বলতে চাই। ফ্যাসিবাদ কোনও দল আনে না। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের রাজনৈতিক

কাঠামোর একটা স্তর। পুঁজিবাদের গোড়ার দিকে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্র এনেছিল। সেই সময়ে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতির উদগাতা। সেইসময়ে বিকাশের সময়ে পুঁজিবাদ বহু বা মাল্টিপুঁজির স্তরে ছিল। তখন মাল্টিপার্টি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি ছিল, কিন্তু কালক্রমে ক্ষুদ্র পুঁজিকে কম্পিটিশনে গ্রাস করে মুষ্টিমেয় বৃহৎ পুঁজি, একচেটিয়া পুঁজি এসেছে। ফলে এখন মাল্টি পার্টি ডেমোক্রেসি কথায় আছে, বাস্তবে টু পার্টি ডেমোক্রেসি সব দেশেই চলছে। এই পুঁজিবাদই একচেটিয়া পুঁজির প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঠাটবাট বজায় রেখে দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। ফলে কোনও বিশেষ দল নয়, আপন শ্রেণিস্বার্থে পুঁজিবাদই ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। ভারতবর্ষে ক্ষমতাসীন হয়ে কংগ্রেসই প্রথম পুঁজিবাদের স্বার্থে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেছে। বিজেপি এখন তাকে আরও পাকাপোক্ত করছে। আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি এমনকি সিপিএমও যেখানে যেখানে সরকার গড়ার সুযোগ পাচ্ছে, সেখানেও ফ্যাসিস্টিক আচরণ করছে।

আজ ভারতবর্ষে অভিন্ন জাতীয় স্বার্থ বলে কোনও কিছু নেই

কমরেড ঘোষ বলেছেন, আজ ভারতবর্ষে জাতীয় স্বার্থ বলে কোনও কিছু নেই। আগে ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে ধনী-গরিবের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। ইংরেজ চলে গেছে, এখন পুঁজিবাদ ক্ষমতায়। মুনাফার স্বার্থে পুঁজিবাদ চলছে। এখন পুঁজিপতি ও শোষিত শ্রেণির স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। ফলে ধনী-গরিবের ঐক্যের প্রশ্ন নেই। এখন একদিকে পুঁজিবাদের শোষণ-লুণ্ঠন আর অন্য দিকে তার বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের শ্রেণিসংগ্রাম। শোষিত জনগণকে আজ সব কিছুকে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে। ব্যক্তিমাত্রই জেনে হোক, না জেনে হোক, হয় পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছে, না হলে সচেতনভাবে শোষিত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করছে।

রাজনীতিও দুটি— হয় পুঁজিবাদের শোষণকে রক্ষা করার রাজনীতি, আর না হলে পুঁজিবাদী শোষণকে উচ্ছেদ করার রাজনীতি। পুঁজিবাদ থাকবে, শোষিত জনগণও থাকবে— এই অবস্থায় সকলের কল্যাণ করব, এটা মিথ্যাচার। ফলে জাতীয় স্বার্থ, দেশের স্বার্থ, এ ভাবে বললে হবে না। দেশ এখন বিভক্ত। ফলে সব কিছুকে শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে।

বিজেপি সরকারের ডবল ইঞ্জিনের তলায় চাপা পড়ছে কোটি কোটি গরিব মানুষ

দেশের আজ যে শোচনীয় পরিস্থিতি আপনারা সকলেই তার ভুক্তভোগী। যখন আমরা আজকের সমাবেশ করছি, সমাজ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই একটা

অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক— এমন কোনও ক্ষেত্র নেই যেখানে কোনও আশার আলো পাওয়া যায়। ক্রমাগত অন্ধকার আরও গভীর হচ্ছে। এর শেষ কোথায়, সীমা কোথায় তাও সাধারণ মানুষের অজানা। সমস্ত দিকে সর্বাত্মক হতাশা— এরকম একটা অবস্থার মধ্যেই আমাদের এই মিটিং করতে হচ্ছে।

সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন এ দেশের গরিব মানুষের মসিহা, মানে ত্রাণকর্তা। কী রকম ত্রাণকর্তা গরিব মানুষের? গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্সে ১২১টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০৭ নম্বরে। ২০২১ সালে ভারতে অনাহারের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে, ঋণ শোধ করতে না পেরে ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৩ জন ভারতীয় আত্মহত্যা করেছে। একটা বছরেই এই সংখ্যক আত্মহত্যা! প্রতি দিন সাড়ে চার হাজার শিশু অনাহারে মারা যায়। বাস্তব সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশি। তিন বছর আগের রিপোর্টে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৯০ লক্ষ মধ্যবিত্ত, এখন তা নামতে নামতে ৬ কোটি ৬০ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। মানে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মধ্যবিত্ত এখন গরিবের স্তরে চলে গেছে। বিজেপির বন্ধু শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি প্রতিদিন আয় করে ১৯৭.৮ কোটি টাকা। অন্য দিকে দেশের ৬৮ শতাংশ মানুষের দৈনিক রোজগার ১৪৬ টাকার কম এবং ৩০ শতাংশ মানুষের রোজগার দৈনিক ৮৩ টাকার কম। গরিবের মসিহা প্রধানমন্ত্রী শিল্পপতিদের ৫৫ লক্ষ কোটি টাকা ট্যাক্স কনসেশন এবং ঋণ মকুব করে দিয়েছেন। অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের ৬০ শতাংশ ঋণ মকুব করে দিতে বলেছে এই বছর। আর ঋণগ্রস্ত সাধারণ গরিব মানুষ দেনার দায়ে আত্মহত্যা করছে। সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির আগুনেও জ্বলে পুড়ে মরছে। এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের গরিবদের জন্য ত্রাতা নরেন্দ্র মোদির অবদান! তাঁরা বলছেন, ডবল ইঞ্জিন সরকার। আমরাও বলি, ডবল ইঞ্জিন সরকার। ইঞ্জিন চালাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাঁরা ড্রাইভার। ইঞ্জিনের পেছনে গাড়িতে বসে রয়েছে আম্বানি-আদানি-টাটা-বিড়লা-মিত্তাল-জিন্দালরা— ভারতের যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি শুধু নয়, মাল্টিন্যাশনালও। আর গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হচ্ছে ভারতের কোটি কোটি গরিব কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষ। এখানে পাঁচ শতাংশ ধনী লোক ৬০ শতাংশ সম্পদের মালিক। আর নিচু তলার পঞ্চাশ শতাংশ গরিব মানুষ তিন শতাংশ সম্পদের মালিক। ২০২২ সালে ৭ লক্ষ ২৪ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। তা হলে কত কোটি শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে ভেবে দেখুন আপনারা। ভারত সহ বিশ্বের সর্বত্র পুঁজিবাদের আজ তীব্র বাজার সংকট। দেশের অধিকাংশ মানুষই বেকার, অর্ধবেকার কিংবা কর্মচ্যুত। ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছেই। তা হলে কিনবে কে? তাই শিল্পের পর শিল্পে লালবাতি জ্বলছে। ওরা স্বীকার করতে চায় না যে, এটা রিসেশন। তাই নতুন শব্দ চালু করেছে 'স্লো ডাউন অফ ইকনমি'।

বিশ্বের সকল সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী দেশ ঋণগ্রস্ত, বাজেটে বিপুল ঘাটতি, বর্তমানে ভারতের ঋণ হচ্ছে ১৫৫ লক্ষ ৮ হাজার কোটি টাকা। সরকারি রাজস্বের ৪০ শতাংশই সুদ শোধ করতে ব্যয় হয়। এ জন্যই জিনিসপত্রের উপর ট্যাক্স চাপায়, যে দামে পেট্রোল ডিজেল বিদেশ থেকে কেনে, তার থেকে অনেক বেশি দামে দেশে বিক্রি করে। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

সামরিক শিল্পের প্রয়োজনেই যুদ্ধ

এই হচ্ছে পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট। তাই একদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বাজেট কার্টেল করছে, অন্য দিকে শিল্পকে কিছুটা চাঙ্গা রাখার জন্য মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রির উপর জোর দিচ্ছে ভারত সহ সব দেশই। এই মিলিটারাইজেশন অফ ইকনমির জন্য প্রয়োজন ওয়ার টেনশন ও লোকাল ওয়ার। লোকাল ওয়ারেও গ্লোবাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্ত হচ্ছে। যেমন ইউক্রেন যুদ্ধে ঘটেছে। ফলে পুঁজিবাদী এই মন্দাজনিত সঙ্কটের ফলে চাকরি হবে কি না, চাকরি পেলেও তা স্থায়ী হবে কি না, সবটাই অনিশ্চিত। প্রথমত আমাদের দেশে স্থায়ী চাকরি উঠে যাচ্ছে, এখন তো কনট্র্যাক্ট সিস্টেম, অস্থায়ী শ্রমিক সমস্ত জায়গায়। এদের কোনও আইনসঙ্গত অধিকার নেই, কোনও স্থায়ী মজুরি ও কাজের নির্দিষ্ট সময় নেই, যখন তখন ছাঁটাই করে দিতে পারে। এ ছাড়াও মাইগ্র্যান্ট লেবার, গিগ শ্রমিক, আউটসোর্সিং, বন্ডেড লেবার চলছে। অভাবের জ্বালায় বাবা-মা মেয়েকে বিক্রি করে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছে, ২০১৯-২১ এই দু'বছরে ভারতে ১৩ লক্ষের বেশি মহিলা হারিয়ে গেছে। এত লক্ষ মহিলা কোথায় গেল? বিদেশে চালান হয়েছে। এ দেশেও চালান হচ্ছে দেহবিক্রির বাজারে। শিশুদেরও বিক্রি করে দিচ্ছে। এ দেশে কয়েক কোটি শিশুশ্রমিক। দাসপ্রথার যুগ যেন ফিরে এসেছে!

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল আরএসএস

কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছে বিজেপি, যে বিজেপি দাবি করে তারা জাতীয়তাবাদের প্রতীক, স্বাধীনতার প্রতীক, দেশাত্মবোধের প্রতীক। বাস্তবটা কী? এই বিজেপিকে গড়ে তুলেছে যারা, সেই আরএসএসের ইতিহাস কী, তা অনেকেই হয়তো জানেন না। যখন আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলন চলছে, তখন আরএসএসের তৎকালীন নেতা গুরু গোলওয়ালকর বলছেন, 'দেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে তা যথার্থ স্বাধীনতা আন্দোলন নয়। এই স্বাধীনতা আন্দোলন প্রতিক্রিয়াশীল। বলছেন, "ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ এবং সার্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা তৈরি হয়েছে। এর ফলে প্রকৃত হিন্দু জাতিতত্ত্বের সদর্থক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনকে কার্যত ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম

এবং জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষের উপরে এই প্রতিক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে। ... তারাই একমাত্র জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক যারা তাদের অন্তরে হিন্দুজাতির গৌরব পোষণ করে এবং সেই লক্ষ্য পূরণে কাজ করে। বাকি যারা দেশপ্রেম জাহির করে হিন্দুজাতির স্বার্থহানি করছে তারা বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু।" এই হচ্ছে গোলওয়ালকরের বক্তব্য।

যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদরা আত্মদান করছেন, সেই সময় গোলওয়ালকররা বলছেন, যারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়ছে তারা প্রতিক্রিয়াশীল, তারা দেশের শত্রু, তারা বিশ্বাসঘাতক। তা হলে গোলওয়ালকরের বিচারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রাই, সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, চন্দ্রশেখর আজাদ, সূর্য সেন, আসফাকউল্লা খান— এঁরা সকলেই বিশ্বাসঘাতক, দেশের শত্রু। তাদের যুক্তি থেকে এটাই দাঁড়িয়ে যায়। সেই জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা কোনও ভূমিকাই নেয়নি। আজ তারাই নিজেদের 'দেশপ্রেমিক' বলে দাবি করছে। এটা কি আপনারা মেনে নেবেন?

স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীরা এখন দেশপ্রেম শেখাচ্ছে

ওরা সাভারকরকে বলছে বীর সাভারকর। নেতাজির পাশে স্থান দিচ্ছে। এই বীর সাভারকরের বক্তব্য কী ছিল, তা আছে আমাদের কাছে। সাভারকর যখন আন্দামানে বন্দি ছিলেন তখন তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে তিনবার মার্সি পিটিশন (দয়া ভিক্ষা) দায়ের করেছিলেন। ১৯১৩ সালের একটি মার্সি পিটিশনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "যদি সরকার তার বহু ধরনের বদান্যতা ও দয়ার দ্বারা আমাকে মুক্তি দেয়, তা হলে আমি ... ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুগত থাকব।" আরেকটা মার্সি পিটিশনে এমন আশ্বাসও দিয়েছিলেন যে, দেশের ভেতরে ও বাইরে যারা তাঁর কথায় ভুল পথে গেছে, তাদের তিনি ফিরিয়ে আনবেন এবং তারা ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করবে। অথচ এ দেশের ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, আসফাকউল্লা সহ অসংখ্য শহিদ হাসিমুখে মাথা উঁচু করে ফাঁসিতে আত্মাহুতি দিয়েছেন, প্রাণভিক্ষা চাননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন চলছে, তখন ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য সৈন্য সংগ্রহ করছিলেন সাভারকর। দেশ ভাগের দাবিও তিনিই প্রথম তুলেছিলেন। ফলে যে বিজেপি-আরএসএসের এই ভূমিকা— তারা এখন দেশবাসীকে দেশপ্রেম বোঝাচ্ছে, তারা এখন জাতীয়তাবাদের স্লোগান তুলছে! দেশের মানুষকে তাদের এই চরিত্র বুঝতে হবে।

আমি আরও বলতে চাই যে, বিজেপি বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ করে দিচ্ছে, ডারউইনকে পাঠ্যবই থেকে বাদ দিয়ে বেদ-বেদান্ত, মনুসংহিতা, সংস্কৃত শিক্ষা—

এগুলিকে উৎসাহিত করছে। আর ভারতীয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন বলছেন, "সংস্কৃত শিক্ষা পদ্ধতি দেশকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই দেশে ইতিমধ্যেই দুই হাজার বছর ধরে এই শিক্ষা চলে আসছে। ... বেদান্ত শিক্ষা দ্বারা যুবকরা উন্নত নাগরিক হতে পারবে না। বেদান্ত যেটা শেখায়, সেটা হচ্ছে এই পরিদৃশ্যমান জগতের কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই। উন্নততর ও উদার শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অঙ্ক, প্রাকৃতিক দর্শন, কেমেস্ট্রি, অ্যানাটমি ও অন্যান্য কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা।" নবজাগরণের পরবর্তী পুরোধা বিদ্যাসাগর বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন, "বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতভেদ নেই। ... ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরেজিতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।" তিনি আরও বলেছিলেন, "আমাদের দেশে এমন শিক্ষক চাই যারা বাংলা ভাষা জানেন, ইংরেজি ভাষা জানেন। আর চাই ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত শিক্ষক।" বিদ্যাসাগর ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। কোনও মন্দিরে যাননি, পূজা করেননি। তা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়ি গিয়েছিলেন, বিবেকানন্দ তাঁকে অন্যতম পথপ্রদর্শক আখ্যা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন।

একই সময়ে মহারাষ্ট্রে জ্যোতিবা রাও ফুলেও কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হয়েছিলেন। এই মনীষীরা নবজাগরণের যে জ্ঞানের আলো প্রজ্জলিত করেছিলেন, যার যতটুকু ক্ষীণ অস্তিত্ব এখনও আছে, বিজেপি-আরএসএস তাকে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দেশকে ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে। ফলে বিজেপি-আরএসএস ভারতীয় নবজাগরণের বিরোধী। বিজেপি-আরএসএস নেতারা এ দেশের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছু আবিষ্কার করছেন, যা হাস্যকর। আধুনিক বিজ্ঞান মূলত ইউরোপ থেকেই এসেছে। তার দ্বারা শিক্ষিত হয়েই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন বসু, সিভি রমন, মেঘনাদ সাহারা বিজ্ঞানে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন।

বিবেকানন্দও বলেছিলেন, ইউরোপ থেকে আমাদের বিজ্ঞানকে নিতে হবে। তিনি আরও বলেছিলেন, "ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকের মতবাদ কী আমরা জানি। আর ইহাও জানি যে, উহা প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববিদদের কী রূপ ক্ষতি করিয়াছে। এক একটি নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইতেছে, অমনি যেন তাহাদের গৃহে একটি একটি করিয়া বোমা পড়িতেছে। আর সেইজন্যই তাহারা সকল যুগেই এই সকল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে।" বিবেকানন্দের এই উক্তি সম্পর্কে বিজেপি-আরএসএস নেতারা কী বলবেন? তাঁরা তো বেদ-বেদান্ত, গীতা, মনুসংহিতাতেই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করছেন এবং সম্ভবত, সেই তত্ত্ব অনুযায়ী চন্দ্রে অভিযান করেছেন বলেও দাবি করবেন!

কে যথার্থ হিন্দু— রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, না আরএসএস-বিজেপি

বিবেকানন্দ বলছেন, "রামায়ণের কথাই যদি ধরেন, অলঙঘনীয় প্রামাণ্যগ্রন্থ রূপে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের ন্যায় কেহ যথার্থ ছিলেন, স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। ... ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাস্তবিকই ছিলেন অথবা তাঁহারা কাল্পনিক চরিত্রমাত্র, এ বিচারের বিন্দুমাত্র আবশ্যিকতা নেই।" এই বক্তব্যে পরিষ্কার, বিবেকানন্দ রামের অস্তিত্বেই বিশ্বাস করতেন না। বাল্মীকি ও তুলসীদাসের রামায়ণে কোথাও উল্লেখ নেই যে রামের জন্মভূমিতে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছে। অথচ ভোটের স্বার্থে মিথ্যা অভিযোগ তুলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে আরএসএস-বিজেপি একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভকে ধ্বংস করাল, যেমন তালিবানরা আফগানিস্থানে ঐতিহাসিক বৌদ্ধমূর্তি ধূলিসাৎ করেছিল। এ ছাড়া এই উপলক্ষে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়েছিল তাতে শত শত প্রাণ, ঘরবাড়ি, সম্পদ ধ্বংস হয়েছিল।

বিবেকানন্দ যথার্থই বলেছেন, "কোনও ধর্মই কখনও মানুষের উপর অত্যাচার করেনি। ... কোনও ধর্মই এই অন্যায় কাজকে সমর্থন করেনি। তবে মানুষকে এই সব কাজে উত্তেজিত করল কীসে? রাজনীতিই মানুষকে এইসব অন্যায় কাজে প্ররোচিত করেছে, ধর্ম নয়"। আর বিবেকানন্দ বলছেন, "ভারতের মুসলিম বিজয় নির্যাতিত গরিব মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিল। সেইজন্য এ দেশের পাঁচভাগের একভাগ মানুষ মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এসব শুধু অস্ত্রের জোরে হয়নি। ... গরিব মানুষ জমিদার ও পুরোহিতদের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।" তিনি আরও বলেছিলেন, "আমার একটি সন্তান থাকলে তার কাছে যা সত্য মনে হবে সে তারই শিষ্য হবে। এটা খুবই স্বাভারিক যে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খ্রিস্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।"

এই বিবেকানন্দকে কি আরএসএস-বিজেপি নেতারা হিন্দু বলে গণ্য করবেন? বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণ বলতেন, জল, পানি, ওয়াটার যেমন এক, তেমনি ভগবান, আল্লা, গডও এক। তিনি মসজিদে নমাজ পড়েছেন, গীর্জায় প্রার্থনা করেছেন, আবার মন্দিরে উপাসনা করেছেন। এই রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে আরএসএস-বিজেপি নেতারা কী বলবেন? কে যথার্থ হিন্দু—রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ না আরএসএস-বিজেপি? ফলে বাস্তবে আরএসএস-বিজেপি যেমন জাতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী, তেমনি যথার্থ হিন্দুধর্মেরও বিরোধী।

বিজেপি রামমন্দির তৈরি করছে শুধুমাত্র আগামী ভোটের জন্য। কিছু দিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে, বিজেপি-আরএসএসের বৈঠক হয়েছে।

আরএসএস পশ্চিমবাংলার বিজেপি নেতাদের পরামর্শ দিয়েছে যে আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে তোমরা এ বারে ভাল করে রামনবমী করো, দুর্গাপূজা করো। এই হচ্ছে তাদের ধর্মভক্তি। ধর্ম নয়, আসল হল ভোটভক্তি। এটাও উল্লেখ করা দরকার, সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতির তীব্র প্রতিবাদ করে নেতাজি বলেছিলেন, "একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী লোক ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের লোভে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। ... স্বাধীনতা সংগ্রামে এ শ্রেণির লোককেও শত্রুরূপে গণ্য করা প্রয়োজন। ... হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ পৃথক— এর চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হতে পারে না। ... হিন্দুরা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে 'হিন্দুরাজের' ধ্বনি শোনা যায়, এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা।" নেতাজির আইএনএ বাহিনীতে কোনও ধর্ম-জাত-প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ ছিল না। এই নেতাজিকে আরএসএস-বিজেপি কি দেশবিরোধী আখ্যা দেবে?

হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরির হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে বিজেপি হিন্দু ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগ তৈরি করছে, আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "ধর্মের মোহ মানুষকে নির্জীব করে রাখে। তারা বুদ্ধিকে নিরর্থক জড় অভ্যাসের নাগপাশে অস্থিতে-মজ্জায় নির্দিষ্ট করে ফেলে।" আর শরৎচন্দ্র আর এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্ব মানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।" সাহিত্য জগতের এই দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রকে বিজেপি কী আখ্যা দেবে?

'ইন্ডিয়া' জোট কোন ভারতের প্রতিনিধি

সম্প্রতি বিরোধী দলগুলি 'ইন্ডিয়া' বলে একটা জোট গঠন করেছে। এই 'ইন্ডিয়া' কোন ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে? এই ইন্ডিয়া কি অত্যাচারিত শোষিত গরিব মানুষের ইন্ডিয়া, নাকি আম্বানি আদানি টাটা বিড়লার ইন্ডিয়া? এই জোটে রয়েছে কংগ্রেস। সেই তো প্রথম দেশে পুঁজিবাদকে শক্ত করেছে, ফ্যাসিবাদের ভিতকে শক্ত করেছে। সেই কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ও সেকুলার বানাচ্ছে সিপিএম। কংগ্রেস আমলে দাঙ্গা হয়নি? ভাগলপুরে, রাউরকেলায়, আসামের নেলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দিল্লিতে শিখ নিধন দাঙ্গা কংগ্রেসই করেছে। এই কংগ্রেস সেকুলার?

যে সমস্ত অগণতান্ত্রিক আইন আছে— টাডা, মিসা, আন ল-ফুল অ্যাক্টিভিটি প্রিভেনশন অ্যাক্ট, আফস্পা— সবই তো কংগ্রেস এনেছে। সেগুলিকেই বিজেপি আরও কঠোর করছে। এই কংগ্রেস গণতান্ত্রিক? '৫৯ সালের ৩১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য শহিদের রক্ত ঝরিয়েছে কারা? ঐক্যবদ্ধ সিপিআইয়ের শহিদ স্তম্ভ আছে বউবাজার মোড়ে চারজন মহিলার নামে।

কংগ্রেসের গুলিতেই তো এঁরা শহিদ হয়েছেন। কংগ্রেসই তো এ দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে সকল স্বাধীন কার্যকলাপ বন্ধ করেছিল। সেই কংগ্রেসকে সিপিএম গণতান্ত্রিক লেবেল দিচ্ছে, সেকুলার বলে জাহির করছে!

আঞ্চলিক দলগুলিও গণতান্ত্রিক নয়

আঞ্চলিক দলগুলিরও কেউ কি গণতান্ত্রিক? গণআন্দোলন দমনে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধে তার তার রাজ্যে সবাই তো ফ্যাসিস্টিক। যারাই গদিতে বসে পুঁজিবাদের সেবা করবে তারাই ফ্যাসিস্টিক হতে বাধ্য। আর কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিতে সরকারে যারা আছে তারা সকলেই চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। একটা কথা মনে রাখবেন, আজ ভারতের বড় বড় বুর্জোয়া পার্টি, আঞ্চলিক বুর্জোয়া পার্টি, সকলেরই নীতি হচ্ছে দুর্নীতি। প্রত্যেকেই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আবার প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ দাবি করে অপরকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলছে। বাস্তবে দুর্নীতিতে একে অপরকে টেক্কা দিচ্ছে। যেমন আম্বানি আদানি টাটা বিড়লা সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য শোষণ করব, কোটি কোটি টাকা লুটব, কে বাঁচল, কে মরল এ সব দেখার দরকার নেই। এই পার্টিগুলিরও একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এমএলএ-এমপি হব, মন্ত্রীত্বের গদিতে বসব, আর টাকা লুটব। এ যেন পাবলিক মানি আত্মসাৎ করার কম্পিটিশন চলছে! যেন, তুমি যখন পাবলিক মানি আত্মসাৎ করছ, আমি করব না কেন? এ যেন একটা অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে! পাবলিকও যেন অনেকটা মেনে নিয়েছে— গদিতে বসলে সবাই খায়, এ নিয়ে বলার কী আছে! এই চিন্তা বিপজ্জনক। সমগ্র পুঁজিবাদই দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই জাতীয় ও আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলি সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। পাবলিককেও তারা নানা ভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করছে।আর ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্স নয়, বাস্তবে 'ক্রিমিনালাইজেশন বাই দি পলিটিশিয়ান'ই হচ্ছে, রাজনীতিবিদরাই ক্রিমিনাল বানাচ্ছে, তাদের প্রশ্রয় ও প্রোটেকশন দিচ্ছে ব্যবহার করার স্বার্থে। আজ দেশে এইসব পলিটিশিয়ান-বৃহৎ পুঁজিপতি-বৃহৎ ব্যবসায়ী-আমলাতন্ত্র-ক্রিমিনালদের একটা নেকসাস গড়ে উঠেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস শাসনেও খুন-দুর্নীতি-সন্ত্রাস চলছেই

এই ইন্ডিয়ার মধ্যে তৃণমূলও সামিল— যে তৃণমূল পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় বসেই ঘোষণা করেছিল, বদলা নয় বদল চাই। কী বদল করেছে? এ তো সিপিএমের ৩৪ বছর শাসনের কার্বন কপি। সিন্ডিকেট, কনট্রাক্টর, প্রোমোটারদের রাজত্ব চলছে। তোলাবাজি, কাটমানি অব্যাহত। চলছে চরম দুর্নীতি। পঞ্চায়েত ভোটের নামে রক্তগঙ্গা বয়ে গেল পশ্চিমবাংলায়। থানা-পুলিশ-প্রশাসন সবই দলীয় কন্ট্রোলে চলে। পার্থক্য হচ্ছে, সিপিএম করত সংগঠিত আর সূক্ষ্মভাবে,

আর এদের সব ঢিলেঢালা, খোলামেলা। এরাও গণআন্দোলনের কণ্ঠরোধ করছে। সরকারি কর্মচারীরা কোনও প্রতিবাদ করতে পারবে না। অন্য কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। এই সরকারের আমলেই আন্দোলনে পুলিশের লাঠির আঘাতে আমাদের দুই কর্মীর চোখ নষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি কুলতলিতে আমাদের দলের নেতৃস্থানীয় কমরেড সুধাংশু জানাকে গলা টিপে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা বলে প্রচার করেছে। প্রথমে পুলিশ প্রশাসনের রিপোর্টে খুন বললেও, শাসক দলের নির্দেশে পরে তা বদল করেছে।

লোককে ঠকাবার জন্য, ভোট পাওয়ার জন্য কেন্দ্র যেমন আয়ুষ্মান ভারত, স্বচ্ছ ভারত, আবাস নির্মাণের কাজ ইত্যাদি করে, এ রাজ্যেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, ক্লাবে অনুদান সবটাই তো ভোটের জন্য হচ্ছে। বেকারত্ব দূর করা, মূল্যবৃদ্ধি রোধ—এ সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে দান-খয়রাতি করছে। এগুলি হচ্ছে আগেকার দিনে যেমন জমিদাররা সারা বছর প্রজাদের রক্ত নিংড়ে শোষণ করত, তারপর বছরে এক-দু'বার কাঙালিভোজন করাতো, তেমনই গরিব মানুষকে এক কেজি চাল, পাঁচশো টাকা, দুর্গাপূজার জন্য পাঁচ হাজার, দশ হাজার টাকা— এ হচ্ছে বেকার যুবকদের কিনে নেওয়া। ভোটের সময় পশ্চিমবাংলায় রক্ত ঝরেছে, কংগ্রেস ও সিপিএমের আমলেও ঝরেছে। ওই সময় বেশি রক্ত ঝরেছে, না এই সময় বেশি রক্ত ঝরেছে, ওই সময় বেশি খুন হয়েছে, কি এই সময় বেশি খুন হয়েছে— এটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, খুন হবে কেন? রক্ত ঝরবে কেন? বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানো, দাঙ্গা বাধানো চলছে ভোটের প্রস্তুতি হিসাবে। একই কারণে মণিপুরেও আগুন জ্বলছে। হরিয়ানায় দাঙ্গা বাধানো হয়েছে। সিপিএম পশ্চিমবাংলায় আয় বাড়ানোর অজুহাতে মদের দোকান চালু করেছিল। তৃণমূল তাকে ছাড়িয়ে আরও বেশি মদের দোকান চালু করল।

১৯৭৭ সালে সিপিএমকে রিগিং করতে হয়নি। তখন জনগণ কংগ্রেস-বিরোধী মানসিকতা থেকে ভোট দিয়েছিল। তারপর সিপিএম যখন জনগণের আস্থা হারায় তখনই বুথ দখল, রিগিংয়ের পথে যায়। ২০০৯ সালে, ২০১১ সালে সিপিএমবিরোধী মানসিকতা থেকে জনগণ দু'হাতে তৃণমূলকে ভোট দিয়েছিল। তখন তাকে বুথ দখল করতে হয়নি, রিগিং করতে হয়নি। আজ তাকে করতে হচ্ছে। কারণ তারা জনগণের আস্থা হারিয়েছে।

ভোটে পুঁজিপতিদের তোলা হাওয়ায় জনগণ ভেসে যায়

নির্বাচন তো একটা প্রহসন। নির্বাচনে বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের পছন্দের দলগুলির পিছনে টাকা ঢালে। আর বুর্জোয়া শ্রেণি সংবাদমাধ্যমগুলোকে, খবরের কাগজ, টিভি চ্যানেলগুলোকে কাজে লাগায়। হাওয়া তোলে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলে গেছেন, মানুষের মধ্যে যদি রাজনৈতিক চেতনা না থাকে, সংঘশক্তি

না থাকে, মানুষ যদি সঠিক বিপ্লবী দল না বোঝে, মানুষ সেই হাওয়ায় ভেসে যায়। আর একটা কথা তো এক অংশের মানুষের মধ্যে এসেই গেছে। ভোটে কিছু টাকা পাব। পাঁচটা ভোটের দাম পাঁচ হাজার টাকা, দশ হাজার টাকা। পঞ্চাশটা ভোট হলে এক লক্ষ টাকা। একটা গরিব পরিবার এক লক্ষ টাকা পাচ্ছে। ফলে টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। এটাই গণতান্ত্রিক নির্বাচন! ভোটের সময় এটাই হয়। এই টাকা কোথা থেকে আসে? পুঁজিপতি, বড় ব্যবসাদার, কালো টাকার কারবারিদের থেকে, আর সরকারি ফান্ড থেকে। তারা ভোটে যে টাকা ঢালে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, ট্যাক্স বাড়িয়ে সুদে আসলে বহুগুণ আদায় করে নেয়। এখন বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল পাঠ্যবইয়ে আছে। বাস্তবে চলছে বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট, ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট, অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট। মানি পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার ও মাসল পাওয়ারই ভোটের ফলাফল নির্ধারণ করে। লোকে আমাদের বলে, আপনারা পাগল। আপনারা ভোটও চান, টাকাও চান। আমরা বলি, হ্যাঁ আমরা পাগলই। এরকম পাগল হয়েই যেন থাকতে পারি। কারণ আমরা মালিকদের টাকায় চলি না। পুঁজিপতিদের টাকায় চলি না। আপনাদের আর্থিক সাহায্যেই চলি। আর পাবলিককে ঠকাতেও চাই না। ফলে রাজনীতি দুটি। একটা পুঁজিবাদকে রক্ষা করার রাজনীতি, আর একটা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার রাজনীতি। এইসব বুর্জোয়া পার্টি— বিজেপি, কংগ্রেস, আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল— এদের রাজনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদকে রক্ষার রাজনীতি। আর এস ইউ সি আই (সি)-র রাজনীতি হচ্ছে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে শোষণমুক্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রাজনীতি।

সিপিএম বামপন্থাকে কলুষিত করেছে

এখন সিপিএমও বামপন্থী আন্দোলনের রাস্তা ছেড়ে পুঁজিবাদ রক্ষার রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে শুধু সিট পাওয়ার জন্যে। সিপিএমের বর্তমান দুর্দশা আগে ছিল না। ঐক্যবদ্ধ সিপিআই একসময় পার্লামেন্টে সর্ববৃহৎ বিরোধী দল ছিল। ১৯৫২ সালে এই কলকাতায় সিপিআই বেশিরভাগ আসনে জিতেছিল। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সিপিআই সিপিএম মিলিট্যান্ট গণআন্দোলনে ছিল। ১৯৬৭ সালে সরকারি গদিতে বসার পর থেকে তাদের পরিবর্তন হতে থাকে। তারা গণআন্দোলনের রাস্তা পরিত্যাগ করতে থাকে। তারপর সিপিএম ৩৪ বছর শাসন করেছে। এই ৩৪ বছরের শাসনে তার তো শক্তি বাড়ার কথা! তাহলে শক্তি ক্ষয় হল কেন? কেন এখনও তৃণমূল বিরোধী জনগণ সিপিএমকে বিকল্প ভাবছে না? কেন আজ তাদের কংগ্রেসের হাত এবং এক পীরের হাত ছাড়া চলে না? সিপিএম কর্মীরা ভেবে দেখুন, দলের নেতৃত্ব দলকে কোথায় নামিয়ে এনেছে! তারা ৩৪ বছর পুঁজিপতিদের স্বার্থে গণআন্দোলন দমন করেছে। সর্বত্র একচ্ছত্র দলীয়

আধিপত্য কায়েম করেছে, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করেছে, দলীয় স্বার্থে অ্যান্টিসোসালদের ব্যবহার করেছে— এ ভাবে বামপন্থাকে কলঙ্কিত করেছে। যার ফলে ব্রিটিশ আমল থেকে কংগ্রেস শাসন পর্যন্ত বামপন্থার ঘাঁটি ছিল যে পশ্চিমবঙ্গ সেখানে দক্ষিণপন্থীরা শক্তিশালী হল, বিজেপি মাথা তুলতে পারল। ১৯৬৯ সালেই কমরেড শিবদাস ঘোষ এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই পরিস্থিতিতে জনসংঘের মতো ধর্মীয় রাষ্ট্রীয়বাদীরা ওঁত পেতে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষা করছে। বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি মানুষের যে আকর্ষণ আজও রয়েছে তা নষ্ট হয়ে গেলে তারা আত্মপ্রকাশ করবে। এ কথাটা ক্ষমতাসীন সিপিএম নেতারা বুঝছেন না। ... এইভাবে কমিউনিজমের সুনাম নষ্ট করে দিয়ে তাকে কালিমালিপ্ত করছেন।" যে অবিভক্ত বাংলায় একদিন দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের প্রভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর হিন্দু মহাসভা মাথা তুলতে পারেনি, সিপিএম-এর শাসনকাল বামপন্থাকে কলঙ্কিত করে সেই সুযোগ করে দিল। শুধু তাই নয়, গত লোকসভা ভোটে আমরা শুনেছি, সর্বত্র একই কথা— 'এখন রাম, পরে বাম'। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট নির্দেশ দিয়েছিল কি না, আমরা জানি না। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সর্বত্র সিপিএম কর্মীদের মুখে এটা শোনা গেছে। এই সুবিধাবাদ কে শিখিয়েছে? সৎ সিপিএম কর্মী-সমর্থকরা ভেবে দেখুন, ভোটসর্বস্ব রাজনীতির স্বার্থে ট্যাকটিক্সের দোহাই দিয়ে সিপিএম নেতৃত্ব আজ কোথায় নেমেছে!

ধর্মের জোয়ার যত বাড়ছে, নৈতিক অধঃপতনও তত বাড়ছে

এই পুঁজিবাদ মানুষের মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে। বিবেককে ধ্বংস করছে। চরিত্রকে হত্যা করছে। হৃদয়বৃত্তি থাকে নাকি যদি হৃদয় না থাকে? ব্যক্তির বিবেক থাকে না যদি সমাজে বিবেক না থাকে। সমাজ বিবেকই ব্যক্তির বিবেকে প্রাণ সঞ্চার করে আর সামাজিক প্রগতিশীল আন্দোলন এই বিবেকের জন্ম দেয়। পারিবারিক জীবনে স্নেহ-মমতা, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য, সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনেও সন্দেহ-অবিশ্বাস-তিক্ততা সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলছে, ছাড়াছাড়িও ঘটছে। সন্তানদের উপর তার ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ছে। এসব নিয়ে চিন্তা করার আগেকার সেই পিতৃত্ব-মাতৃত্ব লুপ্তপ্রায়। অসহায় বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সন্তান রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়, না হলে বৃদ্ধাশ্রমে নির্বাসন দেয়। মদ, গাঁজা, ড্রাগ অ্যাডিকশন বাড়ছেই। আরেকটা অ্যাডিকশন— সেক্স অ্যাডিকশন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা দিন যৌনতা নিয়ে মত্ত থাকো। টেলিভিশনে, মোবাইলে নোংরা ছবি দেখো, নোংরা বই পড়ো, যৌন চিন্তায় ডুবে থাকো। নারীদেহ দেখলেই নোংরামি করো, ইতরামি করো। আর একটা হল কনজিউমার গুডস অ্যাডিকশন। অর্থাৎ পকেটে টাকা না থাকুক, একটা মোবাইল চাই। ঘরে

হাঁড়ি চড়ে না, রাস্তায় বেরোলে একটু চকচকে জামা বা শাড়ি চাই। গ্রামে গরিবদের মধ্যেও চলে গেছে এই ভোগবাদের প্রভাব। এইসব অ্যাডিকশন পুঁজিবাদ নিয়ে এসেছে। কারণ যুবকদের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে না পারলে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই যুবকরা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুব্রমণিয়াম ভারতী, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিংদের জানে না, জানে শুধু ফিল্মস্টারদের, ক্রিকেট প্লেয়ারদের সংবাদমাধ্যমের প্রচারে। তাদের কার সাথে কার প্রেম চলছে, কার সাথে বিচ্ছেদ হচ্ছে, কে কোথায় বেড়াচ্ছে, কার কত ব্যাঙ্ক ব্যালান্স— এইসব খবর। এই যে ধর্ষণ হচ্ছে— প্রতিদিন কাগজ খুললেই পাবেন ধর্ষণের খবর। তিন বছরের শিশু, ছ'মাসের শিশুকন্যা ধর্ষিত হচ্ছে। আশি-নব্বই বছরের বৃদ্ধা ধর্ষিত হচ্ছে! বাবা মেয়েকে ধর্ষণ করছে! গত ২৮ জুলাই কাগজে বেরিয়েছে, আলিপুর কোর্টে মামলা চলছে, ছেলে মাকে ধর্ষণ করেছে। কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি! কোথায় বাস করছি আমরা! এ তো পশুজগতেও ঘটে না! এটা ঘটছে কী করে? পূজা-নমাজ, ধর্মের জোয়ার যত বাড়ছে— ততই এইসবও বাড়ছে। কোনও ধর্মগুরু, কোনও মন্দির-মসজিদ-গির্জা এ সবের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে না। অথচ সব ধর্মই একদিন সব অন্যায়ের প্রতিবাদে লড়াই করেছিল। দেশের যে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হতে পারে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ফুলে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রেমচন্দ, নজরুলরা, দেশবন্ধু, তিলক, লালা লাজপত, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং-রা দুঃস্বপ্নেও কি ভেবেছিলেন? পুঁজিবাদ সভ্যতাকে কোন নরকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে!

ফলে জনগণের মূল শত্রু পুঁজিবাদ। লড়াই হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থার মধ্যে আমাদের দল একমাত্র দাঁড়িয়ে আছে বিপ্লবের ঝান্ডা নিয়ে। আমাদের লক্ষ্য পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমরা বলতে চাই, বিজেপি যদি ভোটে হারে, সেটা ভাল। তার ঔদ্ধত্য, উগ্র হিন্দুত্ব, ডোন্ট কেয়ার ভাব খানিকটা কমবে। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' জোট জিতলেও জনজীবনের কোনও সমস্যারই সমাধান হবে না, সাম্প্রদায়িকতাও দূর হবে না, কারণ পুঁজিবাদের সাথে এদেরও গাঁটছড়া বাধা। এর শরিকরা কেউ সেকুলার নয়। সেকুলার কথার অর্থ হচ্ছে, আমাদের ভাষায় বলছি না, নেতাজির ভাষায় বলছি— 'রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক থাকবে না। রাজনীতি পরিচালিত হবে বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক যুক্তির দ্বারা।' শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথও তাই বলেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ আরও উন্নত রূপে বলেছেন, সেকুলার মানে পার্থিব। এ জগৎই সত্য। তাকে ভিত্তি করেই সেকুলার হিউম্যানিজম।

সেই হিসাবে এরা কেউ সেকুলার নয়। এরা কেউ গণতান্ত্রিকও নয়। বিজেপিকে যদি শিল্পপতিরা ১০০ টাকা দেয়, ওদের অন্তত ৩০ টাকা, ৪০ টাকা দেয় ইলেকশন বন্ডে। এরা কেন্দ্রীয় সরকারি গদিতে বসলে দেশের মূল সব

সমস্যাই থাকবে, পুঁজিবাদের নিয়মে বাড়তেই থাকবে। কারণ বিজেপি ও এদের ইন্ডিয়া জোট উভয়েরই পলিটিক্স বুর্জোয়া পলিটিক্স, এরা একে অপরের বুর্জোয়া অলটারনেটিভ। এর একমাত্র বিকল্প হচ্ছে প্রোলেটারিয়ান পলিটিক্স, প্রোলেটারিয়ান অলটারনেটিভ। শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের অলটারনেটিভ। তাই সর্বহারা অলটারনেটিভ চাই, সর্বহারা বিকল্প চাই। তার জন্য প্রথম চাই সংগ্রামী গণআন্দোলন, শ্রেণিসংগ্রাম। এর জন্যই আমরা বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ জোট চাই। তারা আন্দোলনে আসুক। নিছক কিছু সিট পাওয়ার লোভে এর সাথে, তার সাথে ঐক্য নয়, ঐক্য চাই গণআন্দোলনের স্বার্থে, শ্রেণি সংগ্রামের স্বার্থে। যদি সিপিএম গণআন্দোলনে থাকত তা হলে দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়া যেত। গণআন্দোলনের কত বড় সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল! আমরা সাধ্যমতো একক ভাবে চেষ্টা করেছি। কংগ্রেসের সাথে যাবে বলে, সংগ্রামী আন্দোলন চায় না বলে, তারা আমাদের সাথে ৬ পার্টির বাম ঐক্য ভেঙে দিল, এমনকি আমাদের না জানিয়ে এবং কোনও কারণ না দেখিয়েই। সিপিএম কর্মীরা একবার ভাবুন, কত বড় সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল। ওরা মার্ক্সবাদী না হলেও ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত মিলিট্যান্ট লেফট মুভমেন্ট করেছে। ওদের কর্মীরা মার খেয়েছে, জেলে গেছে, গুলি খেয়েছে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে যে-ই সরকারি ক্ষমতা পেল, এই তাদের ভূমিকা পাল্টাতে শুরু করল। তারাও মালিকদের স্বার্থে ল অ্যান্ড অর্ডার রক্ষার নামে কংগ্রেস-বিজেপির মতোই শ্রমিক-কৃষকদের সংগ্রাম নৃশংসভাবে দমন করেছে, বিরুদ্ধতার কণ্ঠরোধ করেছে। যেমন পেটিবুর্জোয়া পার্টি সরকারি ক্ষমতা পেলে বুর্জোয়া পার্টির মতোই আচরণ করে, ওরাও তাই করেছে। ওরা হচ্ছে মেকি কমিউনিস্ট, আমরা হচ্ছি রিয়েল কমিউনিস্ট। ওরা হচ্ছে রিফরমিস্ট লেফট, আমরা হচ্ছি রেভলিউশনারি লেফট। এখানেই ওদের সাথে আমাদের মৌলিক পার্থক্য।

নিজেদের স্বার্থেই গরিব মানুষকে রাজনীতি বুঝতে হবে

আর জনগণকে বলব, এ দেশে কিছু হবে না— এমন সব চিন্তায় জনগণের কোনও লাভ নেই, বরং ক্ষতি আছে। তাতে শুধু হতাশাই বাড়বে। এই সংকট আরও বাড়তেই থাকবে। সব দলই সমান, মুখে ভাল ভাল কথা বলে, আসলে সবাই সমান— এ কথা বললে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। আমরা সেই দলে নেই। আমরা লোক ঠকাই না, মিথ্যা কথা বলি না। আমরা সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শ নিয়ে চলি। জনগণকে বলব, রাজনীতি বুঝুন। প্রত্যেকবার ভোটে এইসব নেতারা এই করব, সেই করব, নানা রঙিন প্রতিশ্রুতি দেয়। লোকভোলানো বুলি আওড়ায়। কাগজে প্রচার হয়। টিভিতে রেডিওতে প্রচার হয়। আপনারাও হাওয়ায় ভেসে যান। নেতারা ঠকায়, এ কথা ঠিক। কিন্তু আপনারাও ঠকছেন কেন?

আমরাও যদি ঠকাতে চাই, আপনারা ঠকবেন কেন? আপনারা চোখ কান খোলা রাখুন। রাজনীতি বুঝুন। আমরা ঘরসংসার করি, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, সাতে-পাঁচে থাকি না, অত রাজনীতি আমাদের পোষায় না— এই সব কথা বললে বারবার ঠকবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে ঠকেছেন। রক্ত দিয়েছে, প্রাণ দিয়েছে টাটা-বিড়লার ঘরের ছেলেমেয়েরা নয়— সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা। অথচ ক্ষমতা দখল করল পুঁজিপতি শ্রেণি। সেদিন মানুষ বুঝতে চায়নি গান্ধীজি ঠিক, না সুভাষচন্দ্র ঠিক। তখনও জনগণ বলত, আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নিয়ে কী করব? অতশত বুঝি না। আর গান্ধীজি তো অবতার, সন্ন্যাসীর মতো, এরকম ভাব ছিল।

ফল যা হওয়ার হয়েছে। আজও যদি একই জিনিস চলে, রাজনীতি বুঝি না, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, তা হলে বার বার ঠকবেন। রাজনীতি আপনার ঘরে। আপনার হাঁড়ি চড়বে কি না, কড়াইতে তেল ঢালতে পারবেন কি না, ঘরে বাতি জ্বলবে কি না, ছেলেমেয়ের পড়া হবে কি না, চিকিৎসা হবে কি না, চাকরি হবে কি না, হলে থাকবে কি না, খাবার জুটবে কি না— সবটাই তো রাজনীতি ঠিক করছে। আপনি তো রাজনীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন। আপনি একটা দলকে ভোট দিচ্ছেন, তাকে জিততে সাহায্য করছেন— এটাও তো রাজনীতি। অথচ রাজনীতি ভাববেন না, এটা চলে না। মাথা দিতে হবে, ভাবতে হবে। প্রতিদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও যারা পড়তে জানেন, তাদের পড়তে হবে। বাঁচার দায়েই এই কাজ করতে হবে। যারা জানেন না, তাদের অন্যের পড়া শুনতে হবে। বিচার করতে হবে, কোন দল ধনীর, কোন দল গরিবের, কোন দল শোষকশ্রেণির, কোন দল শোষিত জনগণের, কোন দল ইলেকশনের হাওয়ায় ফয়দা তোলে আর কোন দল গণআন্দোলনের, শ্রেণিসংগ্রামের পথে বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়। না হলে বার বার ঠকবেন। এক দল যাবে, আরেক দল আসবে। ওকে দেখেছি, তো এবার একে দেখি। একে দেখেছি, তো এবার ওকে দেখি— এই চলতে থাকবে। বারবার গোলকধাঁধায় ঘুরবেন।

১৫ আগস্ট আসছে। সেই দিন এই নেতারা ভাষণ দেবেন। দেশের কত উন্নয়ন করেছেন, তার ফিরিস্তি দেবেন। এই রাজভবন, দিল্লির প্রেসিডেন্টের ভবন, প্রধানমন্ত্রীর ভবন আলোকমালায় সজ্জিত হবে। তোপধ্বনি হবে। আর বহু তারকাখচিত হোটেলে বিরাট ভোজ হবে। আবার তাদের নিক্ষিপ্ত যে উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিনে পড়বে, সেগুলো কুড়োবে আমাদের দেশের ফুটপাথের ছেলেমেয়েরা যারা জানে না কোথায় তাদের ঘর, কোথায় ঠিকানা, ফুটপাতেই জন্ম, ফুটপাতেই মৃত্যু। নিত্যদিনের মতো ওই দিনও রাতের অন্ধকারে অসহনীয় দারিদ্রপীড়িত মা-বোনেরা দেহবিক্রির বাজারে পণ্য হয়ে দাঁড়াবে। এ চিত্র পরম দুঃখের, অসহনীয় বেদনার।

পুঁজিবাদ-সৃষ্ট এই নিষ্ঠুর শোষণ, ভয়াবহ দারিদ্র, বেকারত্বের যন্ত্রণা, মূল্যবৃদ্ধির আগুন, মনুষ্যত্বের ধ্বংস, ধর্ষণ-গণধর্ষণ, মন্ত্রিত্বের গদিলোভী নেতাদের নির্লজ্জ দুর্নীতি ও ভণ্ডামি— এ সব আপনারা চলতে দেবেন, বাড়তে দেবেন, না কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতি নেবেন? আপনারা কি ভুলতে পারেন, এই দেশেই একদিকে ক্ষুদিরাম হাসতে হাসতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বাঘা যতীন বালেশ্বরের যুদ্ধে যখন বুলেটবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুশয্যায়, তখন তিনি জল চেয়েছিলেন। উপস্থিত ইংরেজ অফিসার জল নিয়ে হাজির। তিনি মাথা নাড়লেন, এই জল স্পর্শ করবেন না। তারপর নিঃশব্দে চোখ বুজলেন। প্রীতিলতা সূর্য সেনকে বলেছিলেন, আমি ফিরব না। আমি লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ করে দেখিয়ে দেব, ভারতবর্ষের মেয়েরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ দিতে পারে। প্রীতিলতা ফেরেননি। আসফাকউল্লাকে ব্রিটিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি হিন্দুদের মধ্যে এলে কেন? কারা তোমাকে এই পথে এনেছিল, তাদের নাম বল, তা হলে আমি তোমাকে বাঁচিয়ে দেব।

আসফাকউল্লা খান দৃঢ়ভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং ফাঁসিতে আত্মাহুতি দেন। ভগৎ সিংকেও তাঁর বন্ধুরা বলেছিল, তুমি যদি রাজি হও, তোমাকে জেল থেকে বের করে আনতে পারি। তিনি রাজি হননি। বলেছেন, আমার নাম এখন বিপ্লবের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এ ভাবে বেরিয়ে এলে সেই প্রতীকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আমি সানন্দে ফাঁসির রজ্জু বরণ করব এই আশা নিয়ে যে ভারতবর্ষের মায়েরাও চাইবে তাদের কোলেও ভগৎ সিং জন্ম নিক। এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হবে। চন্দ্রশেখর আজাদ ঘোষণা করেছিলেন, জীবিত অবস্থায় পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না, হত্যাও করতে পারবে না। এলাহাবাদের পার্কে পুলিশবেষ্টিত হয়ে শেষপর্যন্ত লড়াই করে গেছেন এবং শেষ বুলেটটি নিজের আত্মাহুতিতে কাজে লাগালেন। এঁরা এবং এঁদের মতো আরও অনেকে কী চেয়েছিলেন? এঁদের এই মহান সংগ্রাম, এই মহৎ আত্মদান, অপূরিত স্বপ্ন এবং কোটি কোটি শোষিত মানুষের চোখের জলই কমরেড শিবদাস ঘোষের অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে, এই যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মতবাদ মার্কসবাদ গ্রহণ ও এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) গঠনের প্রেরণা জুগিয়েছে।

এই পার্টিটা আপনাদের,
একে বড় করার দায়িত্ব আপনাদেরই

ফলে কমরেডস ও বন্ধুগণ, এই পার্টিটা এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। এই দল গড়ার ইতিহাস প্রমাণ করেছে মার্ক্সবাদের শক্তি কত অপরাজেয়। কমরেড শিবদাস ঘোষকে কে সৃষ্টি করেছে? মার্ক্সবাদই সৃষ্টি করেছে। আবার কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই মার্ক্সবাদকে আরও উন্নত করেছেন। এই মার্ক্সবাদকে বুঝতে

হবে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারাকে বুঝতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। যাতে তাঁর শিক্ষার ভিত্তিতে উপযুক্ত বিপ্লবী হিসাবে আমরা গড়ে উঠতে পারি, যাতে সর্বহারার মহান নেতা, মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত একমাত্র বিপ্লবী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে আরও শক্তিশালী করতে পারি, গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামকে জোরদার করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে পারি। আপনারা যারা দূর-দূরান্ত থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ নিয়ে এসেছেন, প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা করে যান যে এই দলকে আরও শক্তিশালী করবেন। যাঁরা বয়স্ক, আপনাদের বলব, আপনাদের ঘরের একটি দুটি ছেলেমেয়েকে আমাদের হাতে তুলে দিন। তারা হয়ত গুলিতে মরবে, ফাঁসিতে প্রাণ দেবে, কিন্তু মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে মনুষ্যত্বের ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে বীরের মতো মরবে। ছাত্র-যুবদের বলব ব্যক্তিগত স্বার্থ, লাভ, লোভ ত্যাগ করে এগিয়ে আসুন দলে দলে। আর অন্যদের বলব, 'আপনারা বড় হোন', শুধু এই আকাঙ্ক্ষাই এই দলটার প্রতি ব্যক্ত করলে হবে না— আমাদের বড় হতে সাহায্য করুন। আপনারা সক্রিয় সহযোগিতা করুন। আপনারা ঘরে বাইরে সর্বত্র আমাদের বক্তব্য নিয়ে যান। আমাদের পক্ষে দাঁড়ান। আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই।

পরিশেষে আর একটি কথা বলব। আপনাদের সকলের দায়িত্ব এই পার্টিটাকে রক্ষা করা। আমাদের কোনও কর্মীর ভুলত্রুটি দেখলে আপনারা গার্জিয়ান হিসাবে তাদের সমালোচনা করবেন, শাসন করবেন, সাহায্য করবেন। এটা আপনাদের দায়িত্ব। এই দলটা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত দল। কিন্তু এই দলটা আপনাদের, এ দেশের গরিব মানুষের, এ দেশের শোষিত জনগণের। এই দলটাই আপনাদের বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার। এ দলটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদেরই।

———